অফপ্রিন্ট

সমাজ নিরীক্ষণ

নং ৫১
ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪

সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সামরিক বাহিনী ও রাজনীতি ঃ মূলধারার ব্যাখ্যার কয়েকটি ত্রুটির দিক

আলী রিয়াজ*

সামরিক শাসনের বিভিন্ন দিক — পটভূমি, কারণ, প্রকৃতি ও ফলাফল—নিয়ে আলোচনার একটি শক্তিশালী ধারা ১৯৫০ এর দশক থেকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গড়ে উঠেছে। সামরিক শক্তির রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ঘটনা নতুন নয়। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে সদ্য স্বাধীন দেশগুলোতে ব্যাপকাকারে ক্যুদেতা'র ঘটনা, সামরিক বাহিনী (বা তার অনুরূপ শক্তির) রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ধারা এবং সর্বোপরি 'উন্নয়নশীল' দেশে সংগঠিত শক্তি হিসেবে সামরিক বাহিনীর (বা তার অনুরূপ শক্তির) ভূমিকা বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের চিন্তা-ভাবনার প্রেক্ষাপটে সামরিক শাসন নিয়ে আলাপ-আলোচনা, গবেষণা ও বিতর্কের সূচনা হয়। ১৯৬০ এর দশকে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায় ব্যাপকাকারে ও ইউরোপের কোনো কোনো দেশে সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই নিয়ে আরো বেশী করে গবেষণার তাগিদ অনুভূত হয়। এই ধারা প্রায় দু'দশক ধরে উল্লেখযোগ্য ধরনের মনোযোগ আকর্ষণ করে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সামরিক শাসনের কারণ অনুসন্ধানই গবেষকদের প্রধান বিষয় বলে পরিগণিত হয়। তবে ষাটের দশকের শেষের দিকে এসে গবেষকরা মনোযোগ দিতে থাকেন সামরিক শাসনের ফলাফলের উপর, কেননা ততদিনে বিশ্বের এক বিরাট সংখ্যক দেশে সামরিক শাসন তার দশক, যুগ, পঞ্চবর্ষ ইত্যাদির পূর্তিউৎসব করতে শুরু করেছে। একটি দেশের ভাগ্য উন্নয়নে তার ভবিষ্যত পথরেখা নির্মাণে এবং সর্বোপরি যে সকল অনুমিত কারণে সামরিক শাসনের আবির্ভাব ঘটেছিলো তার অপসারণে সামরিক শাসন কতটা সফল বা ব্যর্থ হয়েছে তা অনুসন্ধান করে দেখার

* গণ যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তাগিদ থেকে সামরিক শাসনের ফলাফল নিয়ে গবেষণার সূচনা হয়। সত্তর দশকের শেষ প্রান্তে ও আশির দশকের সূচনায় দেশে দেশ সামরিক শাসনের 'অবসান' ঘটতে শুরু করে। দেশের প্রত্যক্ষ শাসনভার সামরিক শক্তির হাত থেকে বেসামরিক ব্যক্তিদের হাতে অর্পিত হতে থাকে। প্রধানতঃ শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা হস্তান্তরের এই ধারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এড়ায় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই নতুন প্রবর্ণতার নাম দেন, 'বেসামরিকী-করণ'। কারো কারো মতে সেনাবাহিনীর ব্যারাকে প্রত্যাবর্তনের সময় এটি। কেউ কেউ বলেন, সেনাবাহিনীর রাজনীতি থেকে 'প্রত্যাহার।' অনেকে এর নাম দেন Disengagement যে ভাষায় আর যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, মূল বিষয় একই—কেন ও কি পরিস্থিতিতে সামরিক শক্তি ক্ষমতা ছেড়ে দিচ্ছে, বা আদৌ কি তারা ক্ষমতা ছেড়ে দিচ্ছে? প্রতিনিধিত্ব-শীল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সাবেক-ক্ষমতাসীনরা আদৌ কি আন্তরিক?

গত চার দশকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সামরিক বাহিনী ও রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে এই তিনটি ধারায় অসংখ্য গবেষণা-কর্ম সম্পাদিত হয়েছে। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীদের উৎসাহ ও আগ্রহের দিক থেকে কখনো কখনো একটি অপর-টিকে অতিক্রম করে গেছে বটে, কিন্তু এগুলো কখনোই একটা আরেকটা বাদ দিয়ে দাঁড়ায়নি। সামাজিক বিজ্ঞানের অত্যন্ত স্বাভাবিক ধারায় মত ও পথের ভিন্নতার কারণে এই সকল গবেষণায় অনুসৃত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি। ফলে পরস্পর বিরোধী উপসংহারে উপণীত হয়েছেন গবেষকরা। তবে সাধারণভাবে মিল ও অমিলের ধারাও থেকেছে তার মধ্যে। যেমন, ধরা যাক, সামরিক শাসনের আবির্ভাবের কারণ নিয়ে গবেষণাগুলো। সকল গবেষকেরই চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা—কোনো ক্যু'দেতার ঘটনা ঘটে বা অন্যার্থে কোনো সামরিক শাসন জারি হয়? এই উত্তর পাওয়া গেলে গবেষকরা ভবিষ্যতে কোনো দেশে ক্যুদেতা'র আশংকা কতটুকু তাও নির্ধারণ করতে পারতেন বলেই আশা করেছেন। এই প্রশ্নের গুরুত্ব বা সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশা নিয়ে কোনো রকম মতানৈক্যের অবকাশ নেই। কিন্তু প্রথমেই যে বিষয়টি এক বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হলো কোনো দেশে সামরিক শাসনের কারণ অনুসন্ধানের প্রয়াস কি কেবল ঐ দেশের ঘটনাবলীর মধ্যেই সীমিত থাকা বাঞ্ছনীয়? ভিন্ন ভাষায় বললে, গোটা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সামরিক শাসন জারির ঘটনার পেছনে যে সকল কারণ তা থেকে কি কোনো রকম সাধারণীকরণ

করা সম্ভব? প্রত্যেকটি দেশের সামরিক শাসন জারির ঘটনা / কারন ঐ দেশের বিশেষ বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত হয় বটে, কিন্তু ঐ সকল কারণকে সম্প্রসারিত করে অন্য দেশের জন্যেও কি তা ব্যবহার করা যায়? আফ্রিকার দেশগুলোতে সামরিক শাসনের কারণ নিয়ে বিতর্কের প্রেক্ষাপটে জিমারম্যান[১] বলছেন, এমন কোনো একক ও সহজ দৃশ্য কারণ নেই যা দিয়ে আফ্রিকান সেনাবাহিনীর রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলকে ব্যাখ্যা করা যায় বা তার সম্ভাবনা সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করা যেতে পারে। প্রায় একই ধরনের মন্তব্য করেছেন এ বিষয়ে অন্য একজন গবেষক জোলবার্গ[২]। তাঁর মতে আফ্রিকায় যে সব ক্যু হয়েছে সেগুলো সম্পূর্ণই পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং এগুলোর সাথে আফ্রিকান সমাজের কাঠামো-গত বৈশিষ্ট্য এবং তাদের আন্তর্জাতিক অবস্থানের কোনো রকম সম্পর্ক নেই। সামরিক শাসন সংক্রান্ত গবেষণার এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, স্যামুয়াল ডিকালো মনে করেণ ক্যুদেতা সমূহকে একটিমাত্র কারণ দিয়ে পরস্পরের সাথে পরস্পরকে সংযুক্ত করে দেয়া যায় তা হলো, ক্যুদেতা'র নায়ক ও তাদের বিরোধীদের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈরীতা ও পরস্পরের স্বার্থের দ্বন্দ্ব।[৩] উল্লিখিত তিনজন গবেষকের মন্তব্যগুলোর মর্মবস্তু হলো এই যে, বিভিন্ন দেশে সংঘটিত ক্যুদেতা'র কারণের মধ্যে মিল থাকলেও তা থেকে সাধারণীকরণ করা, একটি ঘটনা থেকে অন্য ঘটনা সম্পর্কে অনুসিদ্ধান্ত তৈরী করা খুব বাঞ্ছনীয় কাজ নয়। নিঃসন্দেহে এই মতে বিশ্বাসীরা একটি বিশেষ দেশের সামরিক শাসনের কারণ অপর দেশে পূর্বে সংঘটিত ক্যুদেতা'র জন্যে উপস্থিত এক বা একাধিক কারণ হাজির করে তা দিয়ে বিশ্লেষণের চেষ্টা করবেন না। বরং তারা ঐ বিশেষ দেশের ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি (এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়) পর্যালোচনা করে দেখতে চাইবেন কি পরিস্থিতিতে ক্যুদেতা'র ঘটনা ঘটে।

কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি সামরিক শাসনের কারণ অনুসন্ধানের একমাত্র দৃষ্টিভঙ্গি নয়। বরং এর ঠিক বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গিটিই হচ্ছে প্রধান স্রোত। যে দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারীরা বিশ্বাস করেন যে, সামরিক শাসন, ক্যুদেতা ইত্যাদির ঘটনা বিভিন্ন দেশে ঘটলেও তা বিশ্লেষণের কতকগুলো সাধারণ সূত্র রয়েছে। এই মত এতই প্রবল যে, তার অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ল্যাতিন আমেরিকা ও সাধারনভাবে যে কোনো দেশের জন্যে 'ব্যবহার-উপযোগী' এই রকম কারণের তালিকা পাওয়া যাবে যাদের

রচনায় তার মধ্যে আছে ও' কেইন,[৪] পাটনাম,[৫] স্মীটার,[৬] সিগেলম্যান[৭] প্রমুখ। এই তালিকাটিকে বিশাল আকার দেয়া সম্ভব। কেননা, এ যাবত কালে সামরিক শাসনের কারণ নিয়ে যে চিরায়ত পর্যায়ের গ্রন্থগুলো আছে (যার লেখক স্যামুয়েল হান্টিংটন[৯] মরিস জানোউইচ[১০] প্রমুখ) তার প্রধান প্রচেষ্টাই হচ্ছে এই রকম একটি সাধারণ তালিকা তৈরী। তুলনামূলক রাজনীতির ছাত্র ও গবেষকরা মনে করেন যে, এই নিয়ে প্রশ্ন তোলারও কোনো কারণ নেই। অর্থাৎ একই ধরনের প্রপঞ্চকে দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করে তুলনা করা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সঙ্গত ঘটনা। রাজনীতির গবেষকদের কাজই হচ্ছে এই।

সামরিক শাসনের কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত গবেষকদের এই দুই মতের সপক্ষে যুক্তি অসংখ্য। সেই বিতর্কে অংশ নেয়া আমাদের লক্ষ্য নয়। তবে আমাদের বোঝা দরকার যে, এইখানেও দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার ফলে গবেষণা পদ্ধতিতে একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। একাধিক দেশে সংঘটিত ক্যুদেতা'কে কতিপয় সাধারণ কারণের আলোকে যারা বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন তাদের গবেষণার অন্যান্য ত্রুটির উল্লেখ না করেও বলা যায় যে, এতে করে প্রত্যেকটি দেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তাতে লুপ্ত হবার আশংকাকে কোনো ভাবেই বাদ দেয়া যায় না।

যে সকল গবেষক সামরিক শাসনের কতকগুলো সাধারণ কারণ নির্দেশের চেষ্টা করেছেন তাদের বক্তব্যের সার সংক্ষেপ করলে দেখা যাবে যে, তাঁরা তিন ধরনের কারণকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। প্রথমতঃ সামরিক বাহিনীর (বা তার অনুপস্থিতিতে অনুরূপ শক্তির) সাংগঠনিক দক্ষতা। দ্বিতীয়তঃ বেসামরিক সরকারের ব্যর্থতা। তৃতীয়তঃ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতি। বলা আবশ্যক যে, এই সকল মোটা রেখায় ভাগ করে দেখানো কারণগুলোর অধীনে অসংখ্য ছোট ছোট উপ-বিভাগ রয়েছে।

সামরিক বাহিনীর সাংগঠনিক দক্ষতার কথা যারা বলেন তাদের বক্তব্যের ভিত্তি হলো সামরিক বাহিনীর প্রকৃতিগত দিক। অর্থাৎ সামরিক বাহিনীর মধ্যে যে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তীতা, সুসংহত নেতৃত্ব উপস্থিত তা সমাজে অন্য কোনো সামাজিক শক্তির মধ্যেই নেই। তদুপরি প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণে তারা অন্যান্যদের চেয়ে অগ্রবর্তী। এই সকলই তাদের মধ্যে এই রকম মনোভাব সৃষ্টিতে সাহায্য করে যে তারা সমাজের অভিভাবকস্থানীয়

এবং সামাজিক সংকট মোকাবেলায় তাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। এই সাংগঠনিক যুক্তির মধ্যে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ উপ-বিভাগ হলো সেনাবাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থের (বা corporate interests) প্রসঙ্গ। অসংখ্য গবেষণার উদাহরণ দিয়ে বলা যাবে যে, এ যাবতকালে সম্পাদিত গবেষণার এক বিরাট অংশেই বলা হয়েছে যে, প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেনা-বাহিনীর নিজস্ব স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলে বা তার কোনো রকম আশংকা দেখা দিলেই সেনাবাহিনী ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। সেনাবাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ বলতে বোঝানো হয়েছে সামরিক খাতে বরাদ্দ, সেনাবাহিনীর আপেক্ষিক সাংগঠনিক স্বাধীনতা এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেনাবাহিনীর ক্ষমতা বহাল থাকা। এই ধরনের কারণ সামরিক শাসনের আশংকাকে বৃদ্ধি করে বললে আপাতঃদৃষ্টে আপত্তি তোলার কোনো যুক্তি নেই। কোনো বিশেষ দেশে বিশেষ একটি ক্যুদেতা'র পেছনে এই ধরনের কারণ সক্রিয় থাকাও অসম্ভব নয়। কিন্তু ভালো করে তাকালেই এর এক ধরনের অন্তঃসারশূণ্যতা চোখে পড়বে। শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি যদি সামরিক শাসনকে ত্বরান্বিত করে তবে যে সকল দেশের সামরিক বাহিনী বেশী সংগঠিত তাদেরই আগে সামরিক শাসনের করতলগত হওয়ার কথা। বাস্তবে কিন্তু তা মোটেই ঘটছে না। যদি তাই ঘটতো তবে কদো'তে সামরিক শাসনের আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্যে সামরিক শাসন জারি হতো হতো। অথবা উল্টো করে দেখলে শেষোক্ত দু'টি দেশের চেয়ে কঙ্গোর সেনাবাহিনী অধিকতর সংগঠিত, সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুবর্তি বলে মেনে নিতে হবে। এর কোনোটাই নিশ্চয় এই ধরনের যুক্তি যারা হাজির করেন তাদের পুরোধা ফাইনার[১১] কেউই মানতে চাইবেন না। প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থের বক্তব্য শুনতে যতটা চমৎকার ও গালভরা শোনায় বাস্তবে সর্বত্র তার প্রয়োগ ততটা বাস্তব সম্মত নয়। এই যুক্তি দিয়ে একটি দেশে প্রথম সামরিক শাসন জারিকে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু যে সব দেশে উপর্যপুরি ক্যু'র ঘটনা ঘটে সেখানে এর কার্যকারিতা কতটুকু? সেনা শাসককে সরিয়ে সেনা-শাসকের আগমনের ঘটনা বিরল নয়। তবে কি বলতে হবে যে, সেনাবাহিনীর প্রধানও কখনো কখনো সেনাবাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করার মতো পদক্ষেপ নেন?

বেসামরিক সরকারের ব্যর্থতাই সেনাবাহিনীকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় ডেকে আনে—একথা সেনাশাসকরা তাদের ক্ষমতা গ্রহণকে বৈধতা দেবার জন্যে

যেমন বলেন ঠিক তেমনিভাবেই গবেষকদের এক বড় অংশ একথা বলে থাকেন। কেউ কেউ একে ভিন্ন ভাষায় অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সংকট বলে চিহ্নিত করেন। আফ্রিকার দেশগুলোর উদাহরণই আবার নেয়া যাক। জোবার্গ অন্য একটি রচনায় ১৯৬২ থেকে ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত আফ্রিকার সাবেক ফরাসী উপনিবেশগুলোতে (মালি, সেনেগাল, আইভরী কোস্ট, টোগো, কঙ্গো, দাহোমী, নাইজার ও গ্যাবন) ক্যুদেতার কারণ বলে হাজির করেন "অদক্ষ, অকার্যকর ও দুর্নীতিপরায়ন" বেসামরিক সরকারকে।[১৩] আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটি দেশের ইতিহাস ঘেটে এই অভিযোগের সত্যতা বিচার করা যেতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টায় আমরা যাবো না। বরং এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যাক এই সকল দেশে সামরিক শাসন জারির পর কোনো মৌলিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিলো কিনা তা থেকে আজ, প্রায় তিরিশ বছর যে কোনো নিষ্ঠাবান সংবাদপত্র পাঠকই বলতে পারবেন যে, এই সকল দেশে ঐ সময় বা তার পরে কোনো রকম প্রাতিষ্ঠানিক বা সরকারী আমলাতন্ত্রে পরিবর্তন ঘটেনি। এটা বিশেষ করে আফ্রিকার ঐ দেশগুলোর বৈশিষ্ট্য নয়। অধিকাংশ সামরিক সরকারই ক্ষমতায় আসীন হয়ে এসন বিশেষ কোনো মৌলিক নীতিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের সূচনা করেন। যাতে করে সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় বা দুর্নীতি নির্মূল হয়ে যায়। উইলিয়াম থম্পসন[১৪] ১৯৪৬ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে সংঘটিত ২২৯টি ক্যু বা ক্যু প্রচেষ্টার ওপর জরীপ চালিয়ে বলেন মাত্র ৮ শতাংশ ক্ষেত্রে নতুন সরকার পূর্ববর্তী সরকারের ভুল (misdeeds) সংশোধনের জন্যে উদযোগ নিয়েছিলো। মোদ্দা কথায়, সামরিক শাসন জারির ফলে নতুন একগুচ্ছ লোক সুবিধাদি লাভ করেছে, একই ব্যবস্থা বহাল রেখে 'দুর্নীতি'র ফায়দা লুটেছে। এই রকম প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কি গড়ে বেসামরিক সরকারের ব্যর্থতাকে সামরিক শাসন জারির কারণ বলা যাবে?

বেসামরিক সরকারের ব্যর্থতার কথা যারা বলেন, তাদের একটি প্রিয় প্রসঙ্গ হলো অর্থনীতির ক্ষেত্রে ঐ দেশের সমূহ ব্যর্থতাকে বড় আকারে উপস্থাপন করা। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যে সকল মাপকাঠি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে তা কতটা গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা খুবই সঙ্গত। আমরা সে বিতর্কে যাবো না। তবে কতকগুলো প্রশ্ন না তুললেই নয়। অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা যারা বলেন তারা কিভাবে বলেন সেটা আগে

দেখা যাক। ওয়েলচ এবং স্মীথ[১৫] এর একটা সার-সংক্ষেপ করেছেন এই ভাবে, 'সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাব্যতা বৃদ্ধি পায় যদি কোনো দেশে অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটছে বলে অনুমিত হয় এবং বিশেষতঃ যদি এই রকম বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে সরকার তা রোধ করতে পারছে না বা এই অবনতির জন্যে সরকারই দায়ী।' কোনো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটার পুরো দায়িত্ব নিঃসন্দেহে কেবল ক্ষমতাসীন সরকারের ওপর বর্তায় না। বিশ্ব অর্থনীতিতে সূচিত পরিবর্তনের কারণেও কোনো দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে। কাঁচামাল বা প্রাথমিক সামগ্রী (primary goods) সরবরাহকারী দেশগুলোর আন্তর্জাতিক বাজার নির্ভরতার কারণে প্রায়শয়ই তাদেরকে এই ধরনের অবস্থার মোকাবেলা করতে হয়। তাছাড়া প্রান্তস্থ (peripherel) দেশগুলো সবসময়ই যে একটা দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থানে থাকবে তা কে-না বুঝতে পারে। তা সত্ত্বেও এই ধরনের পরিস্থিতিকে বেসামরিক সরকারের ব্যর্থতার নজীর বলে হাজির করার ঘটনা অসংখ্য। আর সে কারণেই যারা বেসামরিক সরকারের ব্যর্থতার কথা বলেন তারা এই ধরনের মাপকাঠি ব্যবহার করছেন কিনা সেটা খুব ভালো করে তাকিয়ে দেখা বাঞ্ছনীয়।

অনেকে অবশ্য আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিকে হাজির করেন ব্যর্থতার নজীর হিসেবে। সে ক্ষেত্রেও দেখা দরকার যে, ঐ পরিস্থিতির পেছনে কে/কারা কাজ করছে। চিলিতে আলেন্দে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রত্যক্ষভাবে অর্থ ব্যয় করে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়েছিলো। ফিজির ক্ষেত্রেও ঘটেছে একই ঘটনা। এই বিষয়কে বাদ দিয়ে বিবেচনা করলেই দেখা যাবে যে উভয় ক্ষেত্রেই "আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি" সামরিক শাসনকে "ডেকে এনেছে।"

সবশেষে নজর দেয়া দরকার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতির বক্তব্যের দিকে। ফাইনার,[১৬] হান্টিংটন[১৭] এবং কেনেডী[১৮] তাদের গবেষণাগুলোতে এই ধারনাই দিতে চেয়েছেন যে, সে সকল দেশেই সামরিক শাসনের আবির্ভাব ঘটেছে যেখানে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। কেনেডী ১৯৬০ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত তৃতীয় বিশ্বে সংঘটিত ২০০ ক্যু দেতার ওপর জরীপ চালিয়ে এই অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, যে সরকারের

রাজনৈতিক বৈধতা যত ভঙ্গুর ক্যু'র সম্ভাবনা ততই বেশী। এই ধারায় হান্টিংটন সর্বাধিক উদ্ধৃত ব্যক্তি। এই বিষয়ে তাঁর মতামত ক্লাসিক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। "তৃতীয় বিশ্বে" সামরিক শাসন নিয়ে যাঁরাই কথা বলেন তাঁরা অন্ততঃ একবার হান্টিংটনের কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের কথা স্মরণ করেন। হান্টিংটনের মোদ্দা কথাটা হলো এই যে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রা বেশী হলেও সেই অনুপাতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নি। ফলে সমাজে সৃষ্ট হয় বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি আর তারই সুযোগে সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এই ধরনের সমাজকে হান্টিংটন বলেছেন 'প্রেটোরিয়ান' (Praetorian) সমাজ। প্রেটোরিয়ান সমাজের চিত্র হান্টিংটনের ভাষায়, "ধনীরা ঘুষ দেয়; ছাত্ররা দাঙ্গা করে; শ্রমিকরা ধর্মঘট করে; উন্মত্ত জনতা (mob) শোভাযাত্রায় অংশ নেয় আর সামরিক বাহিনী ক্যু করে।"[১৮] পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৯৬) এই ধরনের সাধারণীকরণের দুর্বলতা বহুবিধ। এই ধরনের যুক্তি দেখিয়ে সোয়াজিল্যাণ্ড, বোৎসোয়ানার সামরিক শাসনের কারণ হয়তো ব্যাখ্যা করা যাবে কিন্তু স্পেনে ১৯৮১ সালে ক্যু প্রচেষ্টার (বা ১৯৮০, ১৯৮১ ও ১৯৮৩ সালে ক্যু'র কথিত ষড়যন্ত্রের) ব্যাখ্যা করা যাবে কি? পোল্যাণ্ডে ১৯৮১ সালে জেনারেল জারুজালেস্কীর ক্ষমতা গ্রহনেরও কি এই কারণ? গ্রীসে ১৯৬৭ ও ১৯৭৩ সালের ক্যু দেতার সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অভাব বিষয়টি যুক্ত করা কি খুবই দুরূহ হবে না? নাকি একথা বলা আবশ্যক হয়ে পড়বে যে, তৃতীয় বিশ্বের জন্যে এই ফর্মুলা কাজে দেবে অন্যদের জন্যে নয়?

হান্টিংটনের এই ধরনের অনুমিতি নিয়ে ডগলাস হিবস্ যে গবেষণা চালান তাতে জনগণের অধিকমাত্রায় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতি, এবং সামরিক শাসনের আবির্ভাবের মধ্যে কোন রকম প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তিনি দেখতে পাননি।[১৯] এই দিক থেকেও হান্টিংটনে সাধারণীকরণ একটা বড় রকমের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে যায়।

আমি আগেও বলেছি, উপরোল্লিখিত কারণগুলো কোনো বিশেষ দেশে বিশেষ মুহূর্তে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে পারে। এ নিয়ে মতানৈক্যের অবকাশ নেই। কিন্তু সমস্যা হলো এগুলোকে কারণ হিসেবে ধরে নিয়ে যখন কোনো দেশের অবস্থা বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয় তখন ঐ দেশের ঐ ক্যু দেতার বিশেষ বৈশিষ্টটি হারিয়ে যাবার আশংকা থাকে। এর বাইরেও

এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির একটা বড় ত্রুটির দিক হলো এই যে, তা সামরিক বাহিনীকে একটি একক ও বিচ্ছিন্ন শক্তি সংগঠন হিসেবে দেখে এবং তার সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ককে সম্পূর্ণভাবে বিবেচনার বাইরে রেখে দেয়। যে কোনো দেশের সেনাবাহিনী (বা অনুরূপ কোনো শক্তি) কেবল কতিপয় ব্যক্তির ইচ্ছে বা স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়ে ক্যু সম্পন্ন করে না বা ক্যু দেতা'র মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে একাই দেশ পরিচালনা করে না। ঐ দেশের অপরাপর সামাজিক শক্তিগুলোও হয় তার সাথে যুক্ত হয় অথবা তার বিরোধিতা করে। যে কোনো ক্যু দেতা সম্পন্ন করতে হলে সামরিক বাহিনীকে ঐ সামাজিক শক্তিগুলোর একটা শক্তিশালী/প্রভাবশালী অংশের (আকারে তা মোট জনগোষ্ঠির তুলনায় ছোট হোক বা বড় হোক) প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ সমর্থনের প্রয়োজন দেখা দেয়। অন্ততঃপক্ষে এই রকম নিশ্চয়তার আবশ্যকতা থাকে যে তারা ক্যু দেতার লক্ষ্যের সাথে অভিন্ন মত পোষণ করবে। এই ধরনের একটা বড় শক্তি হলো ঐ দেশের বেসামরিক আমলাতন্ত্র। আমলাতন্ত্রের বাইরে অন্য সামাজিক শক্তি (বা শ্রেণী) এর সমর্থন আবশ্যক হলেও তা অর্জনের জন্যে ক্ষমতা গ্রহণের পরও ব্যবস্থাদি নেবার অবকাশ থাকে। কিন্তু আমলাতন্ত্রের সমর্থন ও সহযোগিতা দরকার হয় ক্যু দেতা'র সঙ্গে সঙ্গেই। এই ধরনের প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকারের কোনো অবকাশ না থাকলেও সামরিক শাসনের কারনানুসন্ধানী গবেষকরা এই দুই সামরিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার (সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্র) সম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়টি সামরিক শাসনের কারণের সাথে যুক্ত করে না। সামরিক শাসনের আবশ্যিক শর্ত হিসেবেও কখনো তুলে ধরেন না। সামরিক বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন একটি সংগঠন হিসেবে দেখাবার চেষ্টার ফলে সামরিক শাসনের পটভূমি বিবেচনা হয়ে পড়ে অসম্পূর্ণ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তিকর।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সামরিক বাহিনী ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা সংক্রান্ত বিতর্কে না গিয়েও বলা যায়, রাষ্ট্র হলো একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমার মধ্যে আইনগতভাবে অবস্থানরত জনগণ ও সংগঠনসমূহের ওপর সিদ্ধান্ত প্রয়োগের কর্তৃত্বের অধিকারী এবং ঐ সিদ্ধান্ত প্রয়োগের জন্যে প্রয়োজন হলে বল প্রয়োগের অধিকারী একগুচ্ছ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সেনাবাহিনী অন্যতম। অপরাপর প্রতিষ্ঠান থেকে তার ভিন্নতা হলো এই খানে যে, একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থায়

সেনাবাহিনী হচ্ছে ঐ রাষ্ট্রের শক্তি প্রয়োগের হাতিয়ার। শক্তি প্রয়োগের বৈধ একচেটিয়া অধিকার কেবল তারই রয়েছে। এখন এই প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্র ক্ষমতাকে কখন ও কি পরিস্থিতিতে দখল করে ফেলছে তা ঐ রাষ্ট্রের চরিত্র ও প্রকৃতি না আলোচনা করে বোঝা অসম্ভব। অপরাপর প্রতিষ্ঠান সমূহ সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব মেনে নিচ্ছে কেনো? বা সেই পরিস্থিতির সূচনা হচ্ছে কেনো? রাষ্ট্র তার স্বীয় স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যেই কি অন্যান্য হাতিয়ার ব্যর্থ হলে বা ব্যর্থ হওয়ার আশংকা দেখা দিলে তার শক্তি প্রয়োগের হাতিয়ারকে এগিয়ে দিচ্ছে? নাকি অন্য কিছু? সামরিক শাসনের কারণের সাথে রাষ্ট্রের এই সম্পর্কটি কখনোই পূর্বোল্লিখিত কারণ সমূহের মধ্যে আসছে-না। কেনো আসছে না তার ব্যাখ্যায় আমরা এখন যাবো না। তবে অনস্বীকার্য যে রাষ্ট্র ও সেনাবাহিনীর সম্পর্ক বিবেচনায় না নেয়ার ফলে সামরিক শাসনের অন্যতম সম্ভাব্য কারণই থেকে যাচ্ছে বিবেচনার বাইরে।

সামরিক শাসনের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্কের বিষয়টি সামরিক শাসন সংক্রান্ত গবেষণার মূল ধারায় (mainstream) অনুল্লিখিত থাকলেও লাতিন আমেরিকা সংক্রান্ত গবেষণার একটি ধারায় তা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। এই ধারার জনক বলে যাঁকে চিহ্নিত করা যায় তিনি হলেন গুয়েলারমো ও'ডানেল[২০] (Guillermo O'Donnell) ও'ডানেলের আলোচনার প্রত্যক্ষ বিষয়বস্তু সামরিক শাসন বা তার কারণ নয়। তিনি যে বিষয়ে উৎসাহী তা হলো দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে যে রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে উঠেছে তার চরিত্র নির্ধারন। ও'ডানেলের বক্তব্যের সার কথা হলো এই যে, দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোতে গড়ে উঠেছে এক আমলাতান্ত্রিক-কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র (Bureaucratic Authoritarian state, সংক্ষেপে BA state)। এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম হলো যে ঐ রাষ্ট্রে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারক পদগুলো সাধারণতঃ তাদের দ্বারাই অধিকৃত হয় যারা প্রধানতঃ জটিল ও অত্যন্ত আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে সাফল্য লাভ করেছে। ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে সামরিক বাহিনী, বেসামরিক আমলাতন্ত্র ও বৃহদাকৃতির ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। এই ধরনের রাষ্ট্রে রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণের সকল রকমের পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া হয়—হয় বল প্রয়োগের দ্বারা, নতুবা শ্রমিক ইউনিয়ন সহ সকল

ধরনের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরোপের মাধ্যমে। এই ধরনের রাষ্ট্রে, রাজনীতির মতোই অর্থনীতিতে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ হয়ে পড়ে নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, ব্যবসা-বাণিজ্য-প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানা ক্রমান্বয়ে কতিপয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। এই ধরনের রাষ্ট্রে সকল সমস্যার এক ধরনের 'অরাজনৈতিকীকরণ' বা depoliticization ঘটান হয়ে থাকে। অর্থাৎ রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা ও ইস্যুকে দেখান হয় টেকনিক্যাল সমস্যা বলে। ফলে তার সমাধানের বৈধ তৎপরতা সীমিত হয়ে পড়ে উল্লিখিত উচ্চ স্থানীয় প্রযুক্তিগতভাবে সক্ষম প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তা ব্যক্তিদের হাতে।

এই ধরনের রাষ্ট্রকাঠামো কখন গড়ে উঠে? ও'ডানেলের মতে এই ধরনের রাষ্ট্র কাঠামোর আবির্ভাব ঘটে পুঁজি সঞ্চয়ের এক বিশেষ স্তরে। প্রান্তিক ও নির্ভরশীল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে Import Substitution Industrialization (ISI) বা আমদানী-বিকল্প-শিল্পায়ন নীতি অনুসরনের ফলে যে ব্যাপক শিল্পায়ন ঘটে তা এক পর্যায়ে এসে আর এগুতে সক্ষম হয় না। ISI-এর সহজ স্তর অতিক্রম করে এই বন্ধ্যা অবস্থায় উপনীত হওয়ার যে আর্থনীতিক সংকট দেখা দেয় তা জনগণের মধ্যে সৃষ্টি করে ক্ষোভের। আর তারই পাশাপাশি প্রয়োজন হয় বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের (দেশী ও বহুজাতিক) স্বার্থ সংরক্ষণের। এই রকম পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ করে জনগণকে রাজনীতি বিচ্ছিন্ন করতে এবং পুঁজি সঞ্চয় প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে আমলাতান্ত্রিক-কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

ও'ডানেলের বক্তব্যের মধ্য থেকে যে ইঙ্গিতগুলো আমাদের দেখার বিষয় তা হলো সামরিক শাসনের (বা সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রনাধীন রাষ্ট্রের) কারণ নিহিত আছে ঐ রাষ্ট্রের প্রান্তিক অবস্থান, নির্ভরশীল অর্থনীতি, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, পুঁজি সঞ্চয়ের এক বিশেষ অবস্থা এবং আমলাতন্ত্র ও সেনাবাহিনীর মধ্যেকার মৈত্রীর মধ্যে। অন্ততঃপক্ষে দক্ষিণ আমেরিকায় এই সকলের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক এক নতুন ধরনের রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। পুনঃপুনঃ সেনাশাসন, বা সেনাশাসনের দীর্ঘ উপস্থিতি রাষ্ট্রের ঐ বিশেষ চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে জরুরী ও অত্যাবশ্যক।

সামরিক শাসনের সাথে রাষ্ট্র কাঠামোর এই গভীরতর সম্পর্ক বিশেষ বিবেচনার দাবী রাখে এই কারণে যে, তা আপতিক কারণগুলোকে

অতিক্রম করে রাষ্ট্র ও সমাজ সংগঠনের মূল সূত্রের সাথে রাজনীতির এক বিশেষ প্রপঞ্চকে (phenomenon) যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এখানে অবশ্যই মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, অন্যত্র দক্ষিণ আমেরিকার হুবহু অনুকরণ ঘটছে/ঘটবে এমন নয়। দক্ষিণ কোরিয়া'য় সেনাশাসন একই ঘটনাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তা নয়। তবে যে উপাদানসমূহ ও যে ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রক্ষণের (conjecture) বিষয়ের প্রতি ও'ডানেল আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে আমাদেরকে সাহায্য করে অন্য পরিস্থিতিতে একই প্রপঞ্চের কারণ বুঝতে।

সামরিক শাসনের আবির্ভাবের সাথে রাষ্ট্রের চরিত্র ও প্রকৃতি এবং সামাজিক শ্রেণীগুলোর অবস্থানের সম্পর্ককে তুলে ধরেছেন অপর একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী—হামজা আলাভী।[২১] আলাভীর রচনার মূল বিষয় সেনা-বাহিনীর রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের প্রশ্ন নয়, উপনিবেশ-উত্তর (post-colonial) দেশগুলোতে (বিশেষতঃ পাকিস্তান ও বাংলাদেশ) রাষ্ট্রের স্বরূপ অনুসন্ধান করা। হামজা আলাভীর বক্তব্য হলো এই যে, উপনিবেশ-উত্তর সমাজে বিরাজমান শ্রেণীগুলোর তুলনায় রাষ্ট্র হয়ে পড়ে অতি-বিকশিত। তিনি মনে করেন যে, উপনিবেশিক শক্তি আপন শাসন বজায় রাখতে উপনিবেশিক আমলে এমন এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে যা স্বাধীনতা প্রাপ্তি বা উপনিবেশ-উত্তর কালে ঐ সমাজের জন্যে এক অতি-বিকশিত (over developed) প্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভূত হয়। অতি-বিকশিত রাষ্ট্রে আমলাতান্ত্রিক ও সামরিক প্রতিষ্ঠান (apparatus) হয় অত্যন্ত শক্তি-শালী। তদুপরি, স্বাধীনতা-লাভের সময় ঐ ধরনের সমাজে এমন কোনো শক্তিশালী শ্রেণী থাকে যা রাষ্ট্র যন্ত্রের ওপর নিরংকুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ফলে রাষ্ট্র একটি বিশেষ শ্রেণীর করতলগত ও স্বার্থ রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের বদলে হয়ে পড়ে আপেক্ষিকভাবে স্বাধীন (relatively autonomous)। আর যদিও রাষ্ট্র চূড়ান্ত বিবেচনায় পুঁজিবাদের স্বার্থ-রক্ষণের জন্যেই পরিচালিত হয়, তথাপি এই রকম পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র তিনটি শ্রেণীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নেয়। এই তিনটি শ্রেণী হচ্ছে—মেট্রোপলিটান বুর্জোয়া, স্থানীয় বুর্জোয়া ও ভূমি মালিক। শক্তিশালী একক শ্রেণীর অনুপস্থিতি রাষ্ট্রের আপেক্ষিক নিরপেক্ষতাকে যেমন নিশ্চিত করে ঠিক একই ভাবে রাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদান বেসামরিক আমলাতন্ত্র ও সেনাবাহিনী Oligarchy

তৈরী করে ক্রমান্বয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করে।

আলাভীর এই ব্যাখ্যা নিয়ে (বিশেষতঃ তাঁর দাবি যে উপনিবেশ উত্তর সমাজে রাষ্ট্র অতি-বিকশিত) বিতর্ক রয়েছে প্রচুর। বিতর্ক রয়েছে সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা গ্রহণের সাথে উপনিবেশিক আমলে তাদের সূচনার বিষয় নিয়েও। তা সত্বেও লক্ষ্য করবার বিষয় হলো এই যে, একটি সমাজে বিরাজমান শ্রেণী সমূহের শক্তি ও অবস্থান এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলে ঐ শ্রেণীদের সাফল্য/ব্যর্থতার সাথে সেনা শক্তির উত্থান যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আলাভী তা সঠিকভাবেই চিহ্নিত করেছেন।

ও'ডানেল ও আলাভী'র এই ব্যাখ্যার সাথে সম্পূর্ণত একমত না হয়েও বলা যেতে পারে যে, তারা সামরিক শাসনের কারণানুসন্ধানে যে বিশেষ দিকের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন তা সন্দেহতা-তীতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও অবশ্যই বিবেচনার দাবি করে। সামরিক শাসন জারির কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হতে চাইলে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিকে বাদ দেয়া আদৌ সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সামরিক শাসন সংক্রান্ত গবেষণার মূলস্রোতের সম্পূর্ণ বাইরে গিয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সামরিক শাসনের ব্যাখ্যা দাঁড় করা দরকার হয়ে পড়ছে আরো বেশী করে কেননা বাংলাদেশে সামরিক শাসনের প্রপঞ্চটি বারবার ফিরে আসছে এবং এক দীর্ঘস্থায়ী সামরিক শাসনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা সম্প্রতি অতিক্রম করেছি। আবার আমরা তা প্রত্যক্ষ করবো কিনা সেটা নির্ভর করছে যে সকল কারণে সেনা শাসনের আবির্ভাব ঘটে তা আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে উপস্থিত থাকছে কি থাকছে-না তার উপরেই। ব্যক্তিগত আন্তরিকতা ও সততা হয়তো এই আশংকাকে সাময়িকভাবে প্রতিরোধ করতে পারবে, কিন্তু বাস্তবে ঐ কারণ/কারণসমূহ উপস্থিত থাকলে এই অনাকাঙ্খিত অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের মুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই।

তথ্যপঞ্জী

১. E. Zimmerman, 'Towards a Causal Model of Military Coups d'etat,' *Armed Forces and Society*. Vol. 5, 1979. pp. 387-413.

২. A. R. Zolberg, 'The Structure of Political Conflict in the New States of Tropical Africa,' *American Political Science Review*, Vol. 62, 1968. pp. 70-87.

৬. S. Decalo, *Coups and Army Rule in Africa*. New Haven : Yale University Press, 1976.
৪. R. H. T. O'Kane, 'A Probabalistic Approach to the Causes of Coups d'etat,' *British Journal of Political Science*, Vol. 2, 1981. pp 287-308.
৫. R. O. Putnam, 'Toward Explaining Military Intervention in Latin American Politics,' *World Politics*, Vol. 20, 1967. pp. 83-110.
৬. P. C. Schmitter, 'Military Intervention, Political Competitiveness, and Public Policy in Latin America : 1950-6', in *On Military Intervention*, edited by M. Janowitz and Van Doorn. Rotterdam : Rotterdam University Press, 1971.
৭. L. Sigelman, 'Military Intervention : A Methodological Note', *Journal of Political and Military Sociology*, Vol. 2, 1974. pp. 275-281.
৮. W. R. Thompson, 'Corporate Coup-makers Grievances and Types of Regime Targets', *Comparative Political Studies*, Vol. 12. 1980. pp. 485-496.
৯. Samuel Huntington, *Political Order in Changing Societies*. New Haven : Yale University Press, 1968.
১০. Morris Janowitz, *The Military in the Political Development of New Nations*. Chicago : Chicago University Press. 1964.
১১. S. E. Finer, *The Man on Horseback : The Role of Military on Politics*. London : Pall Mall Press, 1962.
১২. Robert E. Dowse, 'The Military in Political Development' in *Politics and Change in Developing Countries*, edited by Colin Leys. Cambridge : Cambridge University Press, 1969.
১৩. A. R. Zolberg, 'Military Interventions in New States of Tropical Africa' in *Military and Modernization*, edited by H. Bienen. Chicago : Aberton-Aldrine, 1970.
১৪. William Thompson, *Grievances of Military Coup-Makers*. Bever ly Hills : Sage, 1973.
১৫. C. E. Welch, Jr Z. A. K. Smith, *Military Role and Rule*. Mass : Duxbury Press, 1974.
১৬. S. F. Finer, পূর্বোল্লিখিত।

১৭. Samuel Huntington, পূর্বোল্লিখিত।
১৮. Gavin Kennedy. *The Military in the Third World*. London : Duckworth, 1974.
১৯. Douglas Hibbs, *Mass Political Violence : A Cross National Causal Analysis*. New York John Wiley. 1973.
২০. Guillermo O' Donnell, *Modernization and Bureaucratic Authoritarianism : Studies in South American Politics*, Berke y : Institute of International Studies, University of California, 1973 ; আরো দ্রষ্টব্য একই লেখকের 'Reflections on the Patterns of Change in the Bureaucratic—Authoritarianism State', *Latin American Research Review*, Vol. 12, No. 1, 1978.
২১. Hamza Alavi. 'The State in Post-Colonial Societies : Pakistan and Bangladesh' in *Imperialism and Revolution in South Asia*, edited by K. Gough and H. P. Sharma, London : Monthly Review Press, 1973.

দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়ন অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশে এর প্রাসঙ্গিকতা

ফেরদৌস হোসেন*
মোঃ আলী আকবাস**

বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ষাটের দশক পর্যন্ত চীন, ব্রাজিল, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, ভারত, মালয়েশিয়া, ফিলিপিন্স, হংকং সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরিয়া উন্নয়নের বিবেচনায় প্রায় সম অবস্থানে ছিল। কিন্তু ষাটের দশকের পর হতে শেষোক্ত দেশ চারটি উন্নয়নশীল অপরাপর দেশের উন্নয়নের গতিকে পেছনে ফেলে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। লক্ষণীয় যে, Stagflation অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান মূল্যমান ও মন্দাবাজারের সহ-অস্তিত্বের ধাক্কায় যখন বিশ্বের অধিকাংশ ধনতন্ত্রী ও আধা-ধনতন্ত্রী দেশ টলটলায়মান, তখনও পূর্ব এশিয়ার চারটি দেশ— হংকং, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরিয়া তাদের অর্থনীতিকে দ্রুত-বেগে অগ্রগতির দিকে নিয়ে গেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অনেক সমাজবিজ্ঞানী, পরিকল্পনাবিদ এবং অন্যান্য পর্যবেক্ষকের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে যে, পূর্ব এশিয়ার এসব দেশের উন্নয়নের পদ্ধতি, নিয়মনীতি ও আদর্শ অনুসরণ করে তৃতীয় বিশ্বের অপরাপর অনুন্নত দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব।

পুঁজিবাদী পথে উন্নয়নে বিশ্বাসী বাংলাদেশের সরকারী পরিকল্পনা-বিদ ও একাডেমিক বিশ্লেষকগণও এ ব্যাপারে মনোযোগী হয়ে উঠেন এবং এই ধারণা ব্যক্ত করতে থাকেন যে, বাংলাদেশের উন্নয়নে এসব দেশের অভিজ্ঞতা যথার্থ বলে বিবেচিত হতে পারে। বিশেষ করে দক্ষিণ কোরিয়াকে বাংলাদেশের উন্নয়নে 'যথার্থ মডেল' হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত হতে থাকে। সরকারী পর্যায় হতেও জনগণের সামনে

* রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
** ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়